দৈনিক সংবাদ
তারিখ 31 JUL 1993
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রসঙ্গ

এ, এন, রাশেদা

এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক লিখিত পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বিজ্ঞান গ্রুপের ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এই ব্যবহারিক পরীক্ষা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে গৃহীত হয় না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান চায় তাদের পরীক্ষার্থীদের হাতে পুরো নম্বরটিই (২৫) তুলে দিতে। এর ব্যতিক্রমও আছে, যদিও সংখ্যায় কম— তারা চায় পরীক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যায়ন হোক। এ মূল্যায়নের ভার অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃপরীক্ষক দু'জনের ওপরই সমানভাবে থাকুক। ব্যতিক্রম এখানেও আছে। এই দু'ধরনের টানাপড়েনের মাঝে পড়ে প্রকৃত পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়ে। ব্যবহারিক পরীক্ষায় অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষক দু'জনই শিক্ষক। শিক্ষকতার মানদণ্ডে দু'জনের একই অবস্থানে থাকার কথা— ছাত্র ও শিক্ষক এই দুই ভিন্ন অবস্থানে। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে তা হয় না,— এ নিয়ে কেউ ভেবে দেখেছেন কি না জানি না। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এ ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রথমে লক্ষ্য করা যাক, ব্যবহারিক পরীক্ষা কিভাবে হয়। পদার্থ, রসায়ন, জীব, পরিসংখ্যান যে দিকেই তাকানো যায়— সর্বত্রই দেখা যায় লেখার প্রাধান্যই বেশি থাকে। রসায়নের ব্যবহারিক পরীক্ষায় রেজাল্ট মিলিয়ে খাতা দেখে লিখতে হয়। আসা যাক জীববিজ্ঞানের কথায়, এখানে দেখে লেখার নিয়ম নেই। তবে প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মাঝে লুকিয়ে দেখে লেখার প্রবণতা রয়েছে। কি করে একে দূরীভূত করা যায় তা একটু ভাবা যাক। যদি ধরে নেয়া যায় যে, অনেক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক ক্লাস নিয়মিত হয় না বা ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় না— সেখানে অনিয়মের কারণ থাকতে পারে। এটি গেল একটি দিক। কিন্তু যেখানে নিয়মিত ক্লাস হয়, শিক্ষার্থীরা গড়পড়তায় মানের দিক থেকে ভাল, সেখানে পরীক্ষার্থীরা কি ধরনের সমস্যার মাঝে পতিত হয় তা একটু বোঝা দরকার— এটি সমস্যার আর একটি দিক। আজকের আলোচনা এই দিকটি নিয়েই।

ধরা যাক, উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান প্রথমপত্রের পরীক্ষার ১ নং প্রশ্ন (আজকের আলোচনা এই পত্র নিয়েই হবে), "নমুনা 'ক' ব্যবচ্ছেদ কর, ইহার অংশগুলোর চিত্র অংকন কর এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। কারণসহ নমুনাটির গোত্র উল্লেখ কর।" এর ৪টি ভাগ আছে— পরীক্ষার্থীকে চার ভাগে উত্তর লিখতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন এত কিছু যখন লিখতেই হয় তাহলে তার ব্যবহারিক নামকরণের মূল্য কোথায়? এবং এই পরীক্ষা খুব কম কলেজেই পালিত হয়। ২ নং প্রশ্নে আছে "কারণ দর্শাইয়া গ, ঘ এবং ঙ নমুনাগুলি সনাক্ত কর এবং 'চ' নমুনাটির গোত্রসহ বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।" এই প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষার্থীদের টেবিলে থাকে এবং এক সময়ে তাদের বলা হয় তোমরা সনাক্তকরণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাও। হয়ত তারা ঐ সময়ে ১ নং প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবুও টেবিলে রাখা প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার্থীদের সনাক্তকরণ টেবিলে যেতে হয়। ব্যাপারটি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। এমনিতেই পরীক্ষার্থীরা থাকে ভীতসন্ত্রস্ত, তার ওপর হয়ত মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখতেই কর্তব্যপরায়ণ বহিঃপরীক্ষক চেঁচিয়ে উঠলেন "তোমরা Move কর"— তার অর্থ পরবর্তী সনাক্তকরণে যাও এবং লেখ। এ ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক বেঁধে দেয়া সময় তিনি না মানলেও কারও করার কিছু নেই। সমস্ত পরীক্ষার্থী এখানে বলির পাঁঠায় পরিণত হয়। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ব্যবহারিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? পরীক্ষার্থীকে ন্যূনতম ভাববার সময় না দিয়ে তাড়া করার পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। থিওরি পরীক্ষাতে যেভাবে নম্বরের বন্টন পরীক্ষার্থীদের সামনে থাকে এখানে তেমন থাকে না। প্রশ্নপত্রের নমুনা মান্ধাতার আমলের। এসব নানাবিধ কারণে বেশির ভাগ কলেজে পরীক্ষার নিয়মকানুন পালিত হয় না— তা হয় প্রহসন। বহিঃপরীক্ষককে বারে বারে চা-নাস্তা দিয়ে বসিয়ে রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

কাজেই ব্যবহারিক পরীক্ষাসমূহকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রয়োজন নতুন আঙ্গিক, প্রশ্নপত্রে পরিবর্তন এবং প্রকৃত ব্যবহারিক করা— তা সব বিভাগের বেলাতেই প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে খাতায় লেখার প্রয়োজনীয়তাকে সংকুচিত করে কে কতটুকু জানে—তা আদায় করে নেয়ার কৌশলের ওপর গুরুত্ব দেয়া দরকার। মান্ধাতার আমলের সেট করা উত্তরের দিকে না তাকিয়ে ছাত্রের সৃজনশীলতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা দরকার। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে এই দরিদ্র দেশে কিভাবে অর্থ এবং সময়ের অপচয় হয় তাও বোঝা যাবে। ধরা যাক সনাক্তকরণের সময় একটি পেঁয়াজ রাখা হলো। যাদের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জ্ঞান আছে তারা জানেন এই পেঁয়াজের ভক্ষণীয় অংশকে বলা হয় শুল্কপত্র যা পরিবর্তিত পাতা, নিচের চাকতির মত অংশকে পরিবর্তিত কান্ড যাকে বলা হয় কন্দ বা বাল্ব এবং তার সাথে গুচ্ছ মূল। পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে দেয়া হয় না কোন্ অংশটি সনাক্ত করতে হবে। অথচ পরীক্ষার্থীকে লিখতে হবে পেঁয়াজের কান্ডের নাম এবং তার বৈশিষ্ট্য, যদিও শিক্ষকের নির্দেশাবলীতে ঐ সকল নমুনার মূল, কান্ড বা পাতা সনাক্তকরণের কথা বলা হয়েছে। তাহলে ছাত্র যদি তার নিজের মতো করে এর যে কোন অংশ সনাক্ত করে, কারণ বা বৈশিষ্ট্য লিখে তাহলে সেট করা উত্তরের মাঝে না পড়ায় পরীক্ষক তা গ্রহণ করেন না। ঠিক তেমনিভাবে একটি কৃষ্ণচূড়ার ডাল দিলে ছাত্রটিকে ওর পুষ্পবিন্যাস-এর নাম লিখতে হবে; কিন্তু সে যদি চট করে তার গোত্র বা ফ্যামিলির নাম উল্লেখ করে তাহলে হবে না এবং পরবর্তীতে যে ফুল দেয়া হবে সেখানে এই উত্তর তাকে লেখতে হবে। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ছাত্রের কাছে যে জিনিস গোপন তার সেট করা উত্তর শুধুমাত্র মুখস্থ রেখে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি কতটা সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত? পরীক্ষার্থীর বিষয়ের ওপর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বা তার মূল্যায়নের অবকাশ না থাকায় পরীক্ষার্থী সবসময় ব্যস্ত থাকে কোন্ প্রশ্নের কোন্ নির্ধারিত উত্তর তাকে দিতে হবে।

অর্থাৎ কোনকালে তৎকালীন চিন্তা থেকে এমন কিছু কে প্রবর্তন করে গেছেন সেখান থেকে আর যেন নতুন কোন চিন্তা হতে পারে না। পরীক্ষার্থীরা যতই সৃজনশীল হোক, যতই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিক অনেক পরীক্ষকই তা গ্রহণ করতে চান না। যেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পড়াশুনা হয়, ছাত্ররা অনেক কিছুই জানার সুযোগ পায় সেখানে তারা নানাভাবে এসবের ব্যাখ্যা দিতে চায়। বহিঃপরীক্ষক গ্রহণ করতে না চাইলে এখানেও অন্তঃপরীক্ষকের সাথে তার হতে পারে দ্বন্দ্ব। এক ধরনের দ্বন্দ্ব অসাধুতার পথ গ্রহণ করার, অন্য দ্বন্দ্ব সৃজনশীলতার পথ গ্রহণ করার। ভাবলে অবাক হতে হয় যেখানে বিজ্ঞানের অনেক শিক্ষকের মাঝেই সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার অভাব সেখানে শিক্ষার্থীদের মাঝে তা বিকাশের সুযোগ কত সীমিত।

তাই রবীন্দ্রনাথের কথাতেই ফিরে যেতে হয়। আজ থেকে একশত বছর আগে ১৮৯২ সালের নভেম্বরে রাজশাহীতে তৎকালীন এক এসোসিয়েশনের আহ্বানে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— "যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না— বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।"

দুঃখ নিয়ে বলতে হয় আজও আমরা সে চর্চাই করে যাচ্ছি। তোতাপাখীর মতো শিখিয়ে দেয়া বুলি আমরা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আশা করে তার মূল্যায়ন করছি। পরিশেষে তাই বলতে চাই সব স্তরেই বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে এর আধুনিকায়ন করার।